গান্ধীবাদ ঃ
ভারতের পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধীজি এবং গান্ধীবাদী দর্শন সম্পর্কে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এই আলোচনায় তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত মার্কসবাদী বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞান এবং ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করার মানসিকতার সাথে বিপ্লবভীতিই গান্ধীজিকে শ্রেণিসমন্বয় ও অহিংসবাদের প্রবক্তা করে তুলেছিল। সর্বত্যাগী ভাবমূর্তির সাথে তাঁর এই চিন্তাধারা কার্যত শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির পক্ষে এবং শোষিত জনসাধারণের সর্বপ্রকার শোষণমুক্তির বিরুদ্ধেই কাজ করেছে।

বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিজম ১৯১৯ সালে ইটালিতে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের নেতা মুসোলিনির নেতৃত্বে প্রথম সংগঠিত হয়। পরবর্তী কালে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশেই ফ্যাসিস্ট সংঘ শক্তি গড়ে উঠতে থাকে। ফ্যাসিবাদের শ্রেণি চরিত্র এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য কী, এই নিয়ে এপিস্টেমোলজির ক্ষেত্রে বহু তর্ক-বিতর্কের অবকাশ থাকলেও দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা জনসাধারণের কাছে আজ ফ্যাসিবাদের সত্যিকারের রূপ তুলে ধরেছে। খুব স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও ইউরোপে ফ্যাসিস্টদের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ে মুক্তিকামী মানুষমাত্রই বিশেষ করে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ফ্যাসিবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে এমনকি শ্রমিক শ্রেণির সবচেয়ে অগ্রণী অংশ তাদের দলগুলি (কমিউনিস্ট পার্টিগুলি) পর্যন্ত সক্ষম হয়নি। তখন প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি কোথায় এবং তার আদর্শই বা কী তা বুঝতে সক্ষম হয়নি অথবা বুঝে থাকলেও জনসাধারণের

সামনে তাকে প্রচার করার এবং জনগণকে ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতির ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব বোধ করেনি। তাই শুধুমাত্র সাংগঠনিক প্রতিরোধের ভিত্তিতে জনগণকে যান্ত্রিক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এইভাবে ফাঁকি দিয়ে রাজনীতি করতে যাওয়ার মাশুল কমিউনিস্টদের পরবর্তীকালে কড়ায়-ক্রান্তিতে গুণে দিতে হয়েছে। এই কথার প্রমাণ মিলবে ইতিহাস থেকে — শক্তিশালী জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অবলুপ্তি, ইটালিতে কমিউনিস্ট পার্টির নিশ্চিহ্ন হওয়ায়, স্প্যানিস রিপাবলিকান দলের পতন ও স্পেনে ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থান। সর্বশেষে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণ বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অশেষ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জার্মান, জাপান ও ইটালির ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন সত্ত্বেও দেখা গেল বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির (যারা সবাই 'অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে'র যোদ্ধা ছিল) সর্বত্রই এমনকি এদের উপনিবেশগুলির মধ্যেও ফ্যাসিবাদ নতুন কৌশলে নতুন রূপ নিয়ে দানা বেঁধে উঠছে। যুদ্ধ বিজয়ের ঢক্কা নিনাদে জনসাধারণ তো দূরের কথা ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের চ্যাম্পিয়ান বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল— তারা বুঝতেই পারল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যা ধ্বংস হয়েছে তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শুধুমাত্র জার্মানি, জাপান, ইটালির ফ্যাসিস্টদের রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তি। ফ্যাসিবাদ তো ধ্বংস হয়ইনি বরং বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির জনসাধারণ ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতির প্রভাবে বিশেষ ভাবে এখনও প্রভাবান্বিত। আর এই জন্যই গণতন্ত্রের মুখোস পরে দেশে দেশে 'পিপলস ওয়ার' ও 'গণতন্ত্র ও জনগণের' জয়ের মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদের নতুন করে সংগঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। ইহাই 'প্যারাডক্স অফ হিস্ট্রি' (ইতিহাসের প্রহেলিকা)। 'ফ্যাসিবাদ একটি আনকোরা সামাজিক ফেনোমেনন' (প্রক্রিয়া), 'ইউরোপের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়েই এই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সংগঠিত হয়েছে' 'বিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক সঙ্কটই ধনতন্ত্রকে রক্ষা করার শেষ অস্ত্র হিসাবে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির জন্ম দিয়েছে'— শুধুমাত্র এইসব ধারণার বশবর্তী হয়েই তখন বিশেষ কেউই এই সত্য বোঝবার চেষ্টা করেনি যে, কোনও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনই শ্রেণি-দর্শন ও শ্রেণি-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই উপরন্তু কোনও না কোনও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠতে বাধ্য। তাই শুধুমাত্র 'ফ্যাসিজম ইজ দি নেকেড ডিক্টেটরশিপ অফ দি

ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস (ফ্যাসিবাদ হল পুঁজিপতি শ্রেণির নগ্ন একনায়কতন্ত্র)' এই বিশ্লেষণটুকুর উপর ভিত্তি করেই ফ্যাসিবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজ জীবনের মধ্যেই এর যা আদর্শগত ভিত্তি রয়েছে এবং কোন বিশেষ ধরনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় ফ্যাসিস্টরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে অর্থাৎ এক কথায় হিস্টোরিক্যাল কন্টিনিউয়িটি (ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা) কী তা বুঝতে পারা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের পিছনকার ইতিহাস অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত দিক, ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিচার করে দেখলে এ সত্য সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে, **মানবতাবাদী মানসিকতাই আজ বিপ্লবভীতির দরুণ সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী জাতীয় অভ্যুত্থান সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ভিত রচনা করেছে।** দর্শনগত ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে দেখতে গেলে 'ফ্যাসিজম ইজ এ পিকিউলিয়ার ফিউসন বিটউইন স্পিরিচুয়ালিজম অ্যান্ড সায়েন্স (ফ্যাসিবাদ অধ্যাত্মবাদ এবং বিজ্ঞানের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ)'।— এ সত্য বুঝতে না পারার ফলেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যত তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করা হোক না কেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে কার্যক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে তা পার্সিয়াল অ্যান্ড ওয়ান সাইডেড অ্যাটাক এগেনস্ট ফ্যাসিজম (ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আংশিক ও একপেশে আক্রমণ) হয়েছে। আমাদের এই কথা বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত।

জনতার উপর যে শ্রেণির নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার স্বরূপ পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করতে হলে কোনও মার্কসবাদীর এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে, নেতৃত্ব কথাটির প্রকৃত অর্থ হয় ইডিয়োলজিক্যাল লিডারশিপ, না হয় টেকনিক্যাল লিডারশিপ অথবা দুটোই একত্রে বুঝিয়ে থাকে। এবং কালচারাল রেভোলিউশন প্রিসিডস টেকনিক্যাল রেভোলিউশন অর্থাৎ আদর্শগত নেতৃত্ব বিপ্লবী জনসাধারণের উপর যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বিপ্লব সংগঠিত করা বাস্তবে অসম্ভব। কারণ ... টু ক্রিয়েট এ মোটিভ ফোর্স ফর দি অ্যাক্সেলারেশন অফ দি প্রসেস অফ আনইন্টারাপ্টেড রেভোলিউশন ইট ইজ ইম্পারেটিভ ফর দি জেনুইন ওয়ার্কিং ক্লাস পার্টি (কমিউনিস্ট পার্টি) টু উইন দি মাসেস ওভার টু ইটস সাইড অ্যান্ড টু আইসোলেট কমপ্লিটলি অল ফর্মস অফ রিঅ্যাকশনারি বুর্জোয়া ইডিওলজিস ফ্রম দি মেইন কারেন্ট অফ

দি রেভোলিউশনারি মুভমেন্ট ফেইলিং হুইচ রেভোলিউশন ক্যান নেভার সাকসিড। (অব্যাহত ভাবে বিপ্লব পরিচালনার গতিকে দ্রুততর করার জন্য তার উপযোগী একটি সুনির্দিষ্ট গভীর উদ্দেশ্যবোধ (মোটিভ ফোর্স) গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি সঠিক শ্রমিক শ্রেণির দলকে (অর্থাৎ একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি) জনগণকে তাদের পক্ষে টেনে নিয়ে আসতে হবে বিপ্লবী আন্দোলনের স্রোতের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ভাবধারা বয়ে গিয়েছে তা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে কারণ তা না করলে বিপ্লব কোনও ভাবেই সফল হতে পারে না।) এই সত্যকে অস্বীকার করে সফল বিপ্লবের কথা চিন্তা করা অবৈজ্ঞানিক। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন ভাবে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়েই জনসাধারণ থেকে সর্বপ্রকার বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। তবেই সাংগঠনিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পঙ্গু করা সম্ভব ও জনসাধারণকে সর্বপ্রকার সংস্কারবাদ ও উগ্রবামপন্থী মতবাদের মোহ থেকে মুক্ত করা সম্ভব। জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন না করে শুধুমাত্র স্লোগান ও টেম্পোর উপরে ভিত্তি করে সাংগঠনিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে বুর্জোয়া সংগঠনের প্রভাব থেকে মুক্ত করে শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ এইভাবে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তীব্র সংগ্রাম চালাবার ফলে হয়ত বা সাময়িকভাবে জনসাধারণের সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার সময়ে এই অজ্ঞ ও যান্ত্রিক গণশক্তি (আনকনসাস ও মেকানিক্যাল মাস ফোর্স) বিপ্লবী দলের প্রধান শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না এবং ক্রমে আস্তে আস্তে বিপ্লবী শিবির থেকে মূল জনশক্তি আলাদা হয়ে যায় এবং বিপ্লবী দল জনশক্তির সমর্থন হারিয়ে ফেলে। তখন হয় সে দল অস্তিত্ব রক্ষা করবার জন্য সংস্কারবাদের পথে এগোতে থাকে নয়ত উগ্র বামপন্থার নীতি অবলম্বন করে নিজেকে দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্নদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ইতিহাস আলোচনা করলে এই ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। ফ্যাসিবাদের সঠিক রূপ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে না পারার জন্যই নাৎসিরা যখন হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করল তখন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জার্মান জনসাধারণ তাকে চিনতে ভুল করল। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের দুর্বলতার এই সুযোগ হিটলার ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছে। 'ফ্যাসিস্টরা বর্বর', 'জনসাধারণকে ঠেঙানোই তাদের কাজ'— জনগণের মধ্যে আদর্শগত দিক থেকে এই ধরনের inadequate (অসম্পূর্ণ) ওপর ওপর ধারণা বর্তে থাকার জন্যই হিটলার ফ্যাসিবাদের দ্বৈত নীতির অপকৌশলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন।

একদিকে ন্যাশনাল সোস্যালিজম-এর প্রচার ও দেশের জনসাধারণের প্রতি সোস্যাল ডেমোক্রেটিক মনোভাব অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে গোটা জাতির ঐক্য সাধনের উদ্দেশ্যে এবং একই সাথে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় ঐতিহ্যবাদের মোহজাল সৃষ্টি করে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষ ছড়িয়ে বিপ্লবের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির পেছনে সংঘবদ্ধভাবে গোটা দেশকে জড়ো করা, কেন না এ কাজ সম্পন্ন করা বুর্জোয়া শ্রেণির রক্ষণশীল অংশের পক্ষে অসম্ভব। এ কাজ একমাত্র বুর্জোয়াদের সেই অংশের দ্বারাই সম্ভব, যাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে প্রগতিশীল বলে আজও একটা মিথ্যা মোহ বর্তমান। মানবতাবাদী জাতীয় বুর্জোয়াদের এই তথাকথিত প্রগতিশীল অংশই রাজনীতির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল সোস্যালিজম (জাতীয় সমাজতন্ত্র), ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম (গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র) বা সোস্যালিস্ট প্যাটার্ন অফ সোসাইটি (সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা) বা ন্যাশনাল কমিউনিজম (জাতীয় সাম্যবাদ), র‍্যাডিক্যাল সোস্যালিজম (আমূল সংস্কারমূলক সমাজতন্ত্র)— এইসব মতবাদের আমদানি করে থাকে। অনুকূল পরিবেশে বুর্জোয়াদের এইসব তথাকথিত আপাতদৃষ্ট র‍্যাডিক্যাল মতবাদ, প্রোগ্রাম ও স্লোগানের আড়ালে প্রতিবিপ্লবী জাতীয় ঐক্য সাধনের মধ্য দিয়েই সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়ে থাকে। এতো গেল পুঁজিবাদের এই সর্বাত্মক সঙ্কটের দিনে কিভাবে মানবতাবাদীদের এক অংশ **একদিকে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং অপরদিকে নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধগুলির সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যবাদের একটা আপসরক্ষা করে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়ে থাকে।**

অন্যদিকে প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদনের অরাজকতা, সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা অংশে দূর করার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা, নিজের ইন্টারন্যাল কন্ট্রাডিকশনকে (অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে) যথাসাধ্য মিনিমাইজ করা (কমিয়ে আনা), ন্যাশনালাইজেশন (জাতীয়করণ) ঘটানোর পরিপূরক প্ল্যানিং এবং সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ইকনমিক পলিসি গ্রহণের (পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে আপসের অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের) মারফত একদিকে জনসাধারণের কিছু কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্র ও একচেটে পুঁজির কোয়ালেসেন্স-এর (মিশিয়ে দেওয়া ও মিলন ঘটানোর) পথে পা বাড়ানো অর্থাৎ এগ্রিগেট ইন্টারেস্ট অফ ক্যাপিটালিজম-এর (ধনতন্ত্রের সামগ্রিক উদ্দেশ্যের) স্বার্থে রাষ্ট্রকে ভার্চুয়ালি (কার্যত) একচেটে পুঁজির দাসে পরিণত করা। এইভাবে প্রগতির চমক লাগিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হওয়ায় এবং সেই সুযোগে কমিউনিস্ট পার্টি

এবং তার বিপ্লবী জনগণের সংগঠনগুলির উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল ফ্যাসিস্টরা। জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির এই শোচনীয় পরিণতির পরেও, ফ্যাসিবাদের দর্শন ও ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতির মূল স্বরূপ কী তা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বুঝতে সক্ষম হয়নি এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে প্রত্যেক দেশেরই ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক যুদ্ধ শিবির জার্মান, জাপান, ইটালি অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ান হিসাবে ফ্যাসিস্টরাও যুদ্ধ জয়ের জন্য লড়েছিল। ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্টে থিয়োরি এবং প্র্যাকটিস-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় রকমের অসামঞ্জস্য এখানে। তাই প্রত্যেকটি বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও সৎব্যক্তি মাত্রের কাছেই আমরা পরিষ্কার ভাবে এই কথা পৌঁছে দিতে চাই যে, আন্দোলনের ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট হিসাবে যাদের আপনারা রুখতে চান, দেশের জাতীয় সংস্কৃতির জীবনেও তাদের প্রভাবকে এককথায় ফ্যাসিবাদের দর্শনগত ভিত্তি ও তার সংস্কৃতিকে যদি জনসাধারণের সমক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম না হন তাহলে কোনও একটি বিশেষ ফ্যাসিস্ট সংঘশক্তিকে ধ্বংস করতে সক্ষম হলেও ফ্যাসিবাদকে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে আবার নতুন ফ্যাসিস্ট সংঘশক্তি গড়ে উঠবে এবং এই পথে বারবার প্রতিক্রিয়ার জয়কে সম্ভব করে তোলা হবে।

ভারতবর্ষে আজ ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তি কায়েম হয়েছে এবং ভারতবর্ষের সকল জনসাধারণই আজ জাতীয় সরকারের ফ্যাসিস্ট স্বরূপ সম্বন্ধে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে। কংগ্রেসি ফ্যাসিস্টদের প্রতি জনসাধারণের মনে বিন্দুমাত্র মোহ অবশিষ্ট না থাকলেও ভারতীয় ফ্যাসিবাদের সংস্কৃতিগত ভিত্তি গান্ধীবাদ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরনের দর্শন ও আধ্যাত্মিক মতবাদের ভিতর নিহিত রয়েছে, সেই সব ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতির স্বরূপ আজও জনসাধারণের কাছে ধরা পড়েনি। যতদিন পর্যন্ত না গান্ধীজির শ্রেণি-সমন্বয় ও অহিংসা মতবাদের স্বরূপ জনসাধারণ পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করতে পারছে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে যত রকমের অতিপ্রাকৃত (সুপার ন্যাচারাল) ভাবধারা মিশে রয়েছে তার থেকে বিপ্লবী জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রভাবমুক্ত করা না যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট সংঘশক্তিকে ধ্বংস করা বাস্তবে সম্ভবপর নয়। এরজন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং সাথে সাথে দ্রুতগতিতে জনগণের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা। এর কোনওটিকে বাদ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রকারান্তরে ফ্যাসিস্টদেরই সাহায্য করা হবে। তাই গান্ধীবাদ কী এবং ভারতবর্ষের ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতির ব্যাপক রূপ কী জনসাধারণকে সে সম্বন্ধে আজ আর অজ্ঞ থাকলে চলবে না। গান্ধীবাদের

মানবতাবাদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে তার ফ্যাসিস্ট রূপ জনসাধারণকে চিনিয়ে দেওয়াই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান কর্তব্য। "গান্ধিজম ইজ এ সাব্‌লিমেটিক ট্রান্সফর্মেশন অফ বুর্জোয়া ক্লাস ইন্‌স্টিংক্ট অরিজিনেটেড থ্রু দি প্রসেস অফ ফিউসন অফ দি সেন্সেস অফ বুর্জোয়া মরাল ভ্যালুজ অ্যান্ড অ্যান্টি-ওয়ার্কিং ক্লাস ফিয়ার কমপ্লেক্স অফ রেভেলিউশন অফ গান্ধি।"*

অর্থাৎ সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের নিয়মটিকে অস্বীকার করে তিনি শ্রেণি বিভক্ত সমাজে সর্বমানবের কল্যাণ (অর্থাৎ উভয় শ্রেণির একই সাথে কল্যাণ) সাধন করতে চেয়েছিলেন বলেই একদিকে বুর্জোয়া মর‍্যাল ভ্যালুজ-এর (নৈতিক মূল্যবোধগুলির) আবেদন তাঁর মধ্যে জনতার প্রতি অশেষ মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছিল। অপরদিকে পুঁজিপতি শ্রেণির বিপ্লব ভীতিও একই সাথে তাঁর চিন্তাধারায় অজ্ঞাতসারেই কাজ করে চলেছিল। ফলে নিষ্ঠা ও সততার সাথে জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করলেও যে মতাদর্শ অর্থাৎ গান্ধীবাদের জন্ম তিনি দিলেন— তা বাস্তবে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থকেই রক্ষা করেছে ও আজও করে চলেছে।

অথচ অনেকেই একথা জানেন না যে, শ্রেণি বিভক্ত সমাজে (আমাদের সমাজও একটি শ্রেণি বিভক্ত সমাজ) যেকোনও ব্যক্তির চিন্তাই, আমরা চাই বা না চাই, আসলে কোনও না কোনও শ্রেণির চিন্তা হতে বাধ্য। এ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করলে একজন তার নিজের অজ্ঞাতসারেই যে শ্রেণিকে তিনি সেবা (সার্ভ) করতে চান না—সেই চিন্তারই বলি (ভিক্টিম) হয়ে পড়তে পারেন। গান্ধীজির মতো মানুষের ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যাপারই ঘটেছে। তাই প্রায় সমস্ত মার্কসবাদীরা যখন একসুরে গান্ধীজিকে "হিপোক্রিট" বা ভণ্ড বলেছেন আমরা তাঁদের সাথে একমত হতে পারিনি। গান্ধীজি সম্বন্ধে এরূপ বিশ্লেষণের সঙ্গে আমাদের বরাবরই বিরোধ। গান্ধীজি একজন সৎ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন— এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তা নাহলে বহু অনেস্ট এবং ডেডিকেটেড লোক— তাঁরা কেউ বাজে লোক ছিলেন না, যাঁরা সর্বস্ব দিতে পারতেন— তাঁরা সব দলে দলে গান্ধীজির শিষ্য হয়েছেন কি করে? হিপোক্রিট (ভণ্ড) হলে এভাবে গোটা দেশকে তিনি তাঁর পেছনে জড়ো করতে সক্ষম হতেন না। গান্ধীজির ভূমিকার এমন 'সহজ' ও 'সরল' রূপ, ওভার সিমপ্লিফায়েড (অতি সরলীকৃত) ব্যাখ্যা সেদিনকার আন্দোলনের তত্ত্বগত ও আদর্শগত নেতৃত্বের দেউলিয়াপনারই প্রমাণ। গান্ধীজির শ্রেণি-চরিত্রের এমনতর সহজ ও সরল ব্যাখ্যার দরুনই সেদিন আমরা গান্ধীজির নেতৃত্ব ও ভাবাদর্শের

* তাঁর নিজের 'সোস্যাল ডেমোক্রেসি এ্যান্ড গান্ধীজিম আনমাস্কড' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

প্রভাব থেকে দেশকে ও জনসাধারণকে রক্ষা করতে পারিনি। এইভাবে অযথা তাঁকে ছোট করতে গিয়ে জনসাধারণের কাছে আমরা নিজেদেরই ছোট করেছি। গান্ধীজির গায়ে এতটুকু আঁচড়ও কাটতে সক্ষম হইনি। গান্ধীজির মতাদর্শের সঙ্গে আমাদের বিরোধ এদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। গান্ধীজির আদর্শে দেশের সর্বনাশ হয়েছে, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ সংহত (কনসলিডেটেড) হতে সুযোগ পেয়েছে এসবই সত্য কথা। কিন্তু গান্ধীজি জেনে শুনে ইচ্ছে করেই পুঁজিপতিদের দালালি করেছেন, এরূপ বিশ্লেষণ অতি সরলীকৃত ও অবৈজ্ঞানিক। গান্ধীজি তাঁর মনগড়া ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রেণি সংগ্রামকে অস্বীকার করতে গিয়ে এবং সাধারণভাবে দেশ ও জনসাধারণের কল্যাণের কথা ভেবে, শ্রেণি সম্পর্কে কোনও বিশেষ বক্তব্য না রেখে, তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি আসলে যে শ্রেণির চিন্তা ও স্বার্থ প্রতিফলিত করেছেন, তা হচ্ছে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি। পুঁজিপতিরা কিন্তু তাদের শ্রেণি প্রবৃত্তির (ক্লাস ইনস্টিংক্ট) দ্বারা সহজেই তা ধরতে পেরেছিল। তাই তারা গান্ধীজিকে সমস্ত দিক থেকে সাহায্য করেছে। পুঁজিপতিরা ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে, এখানে তাদের ক্ষতি নেই বরঞ্চ মঙ্গল আছে। শ্রেণি সচেতন না হলে যে কোনও প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয় এবং গান্ধীজির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

অর্থাৎ গান্ধীজি শ্রেণি সচেতন না হওয়ার ফলে তাঁর চিন্তাধারায় তাঁর অজ্ঞাতসারেই ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির ভাবনা ধারণাগুলি প্রধানত কাজ করে চলেছে। ফলে ধর্ম ও ভারতীয় ঐতিহ্যবাদের সাথে বুর্জোয়া মানবতাবাদের ভাবনা ধারণাগুলিকে মিলিয়ে তিনি যে মতবাদ দাঁড় করালেন এবং যে সংগ্রাম পদ্ধতি অনুসরণ করে চললেন, তাতে দেশের ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করবার মতো ইচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থকে সংহত হতে সাহায্য করলেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর ইচ্ছারই বিরুদ্ধে এবং অজ্ঞাতসারেই ঘটল।

সুতরাং শ্রেণি বিভক্ত সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই কোনও না কোনও শ্রেণির সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনও না কোনও শ্রেণি স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। শ্রেণি নিরপেক্ষ চরিত্র ও মনোভাবের কথা চিন্তা করা অবাস্তব এবং নিছক কল্পনাই শুধু নয় উপরন্তু শোষিত জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার ও বিপথে চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদের সামনে অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পন্ন শ্রেণি স্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অতি-মানবের (সুপারম্যান) আদর্শ স্থাপনা করার অপকৌশলও বটে। এই ভাবে শোষক শ্রেণি প্রায় প্রত্যেক দেশেই এক একটি

অতি-মানবকে খাড়া করে জনসাধারণের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করার অপচেষ্টা করে চলেছে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ করার বিষয় এই যে, এই সমস্ত মহামানব বা প্রফেটদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় সমস্ত রকম ত্যাগ স্বীকার করে জনসাধারণের সাথে এমনভাবে নিজেদের এক করে ফেলার চেষ্টা করেন যে আপাতদৃষ্টিতে স্বভাবতই মনে হয় এরাই বুঝি জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের সত্যিকারের পথপ্রদর্শক। কারণ এদের বাস্তব কর্মজীবন ও চিন্তাধারার মধ্যে এদের শ্রেণি-চরিত্র এমন প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত থাকে যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এমনকি তারা নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবচেতন স্তরে লুক্কায়িত আসল রূপ বা শ্রেণি-চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে না। সাধারণত জনসাধারণ মনে করে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে যেতে সক্ষম হয়েছে সেই তাদের মুক্তি আন্দোলনের নেতা হবার যোগ্য ব্যক্তি। অতি-মানবতাবাদের জন্যই এই ধরনের সাধারণ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। একমাত্র দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সমাজ বিজ্ঞানের সহায়তায় এই কথা বোঝা সম্ভব। সে ব্যক্তির মানসিক কাঠামো তার শ্রেণি-চরিত্রের সুপার স্ট্রাকচার (উপরিকাঠামো) মাত্র অর্থাৎ চলতি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তি মাত্রেরই যে সম্বন্ধ রয়ে গেছে তারই উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির মানসিক কাঠামো— এক কথায় তার ব্যক্তি চরিত্র গড়ে উঠেছে। কাজেই এক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বার্থত্যাগই বড় কথা নয়, তার শ্রেণি-চরিত্র ও শ্রেণি-স্বার্থ কী তার সঠিক বিশ্লেষণই বড় কথা। এবং যেহেতু কোনও কর্মই উদ্দেশ্যবিহীন নয় সেইহেতু কার্যকারণের নীতির নিয়ম অনুসারে ব্যক্তির স্বার্থত্যাগেরও কারণ রয়েছে। আর সে কারণ বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে এর পিছনে কোন শ্রেণি-স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। অবশ্য এ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব সময় সেই ব্যক্তি সচেতন নাও থাকতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শোষিত জনসাধারণের সবচেয়ে বড় শত্রু এই সমস্ত সাধু মহাত্মার দল ও তাঁদের বহুরূপী মানবতাবাদ। কারণ সোজা সরলরেখায় প্রতিনিয়ত শোষক শ্রেণির কাছ থেকে যে অত্যাচার জনসাধারণের উপর নেমে আসে ও যে দল বা মতবাদ সোজাসুজি বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে তার স্বরূপ জনসাধারণ সহজেই চিনে নিতে পারে। কিন্তু মানবতাবাদ বা এই ধরনের আধ্যাত্মিক মতবাদের পিছনে যে বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকে জনসাধারণের পক্ষে তার স্বরূপ চিনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে গান্ধীবাদও এই একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছে। গান্ধীজির ব্যক্তিগত জীবনের বহুবিধ ত্যাগ ও রোমাঞ্চকর ঘটনার আড়ালে গান্ধীবাদের প্রধান শ্রেণি চরিত্র (ডমিন্যান্ট ক্লাস ক্যারেক্টার) মুষ্টিমেয় কয়েকজন

মার্কসবাদী ব্যতীত গোটা দেশের জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাত রয়ে গেছে। কারণ গান্ধীজির চিন্তাধারা যে সমস্ত বুর্জোয়া সুপারস্টিশন (বদ্ধমূল বুর্জোয়া কুসংস্কার) থেকে উদ্ভুত সে সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা না থাকার জন্যই গান্ধীজির তথাকথিত মানবতার আদর্শে জনসাধারণ এত সহজে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গোঁড়ামি ও অন্ধতাজনিত যে আত্মপ্রত্যয় ও অন্তরাশ্রয়ী চিন্তাধারা, গান্ধীবাদের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করেছে, যত কঠিন কাজই হোক জনসাধারণকে সে সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে না পারলে গান্ধীবাদের প্রভাব থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। গান্ধীজির অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক শক্তির ধারণা, অবৈজ্ঞানিক ও চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তারই পরিচায়ক। বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও কতখানি অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন হলে প্রকাশ্যে নির্লজ্জভাবে এই কথা বলা যায় যে, "থিঙ্কিং ইজ দি কন্টেমপ্লেশন অফ গড" (চিন্তা ঈশ্বর চিন্তার প্রতিফলন)। ফ্যাসিস্ট দার্শনিক জেন্টাইল এই কুখ্যাত মতের প্রচারক। জেন্টাইল-এর এই ননসেন্স এক্সপ্রেশন গান্ধী-দর্শনের প্রাণকেন্দ্র। গান্ধীজির অহিংসবাদ ও শ্রেণি-সমন্বয় নীতির অযৌক্তিকতা থিওরি অফ বিলিফ-এর (অন্ধভাবে বিশ্বাস করার তত্ত্বের) দোহাই পেড়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। আর এই থিওরি অফ বিলিফ-এর গোড়ার কথা হচ্ছে থিঙ্কিং ইজ দি কন্টেমপ্লেশন অফ গড। গান্ধীজির মতে অহিংসা ও শ্রেণি-সমন্বয়ের মতবাদ বৈজ্ঞানিক কী অবৈজ্ঞানিক সেটা আলোচনার বাইরে এবং ইহা যেহেতু মর‍্যালিটি (নৈতিকতা) সম্মত (?) যা আসলে বুর্জোয়া সেন্স অফ মর‍্যাল ভ্যালু (বুর্জোয়া নৈতিকতা থেকে উদ্ভুত মূল্যবোধ) ছাড়া আর কিছুই নয়, সেইহেতু এই পথই সমাজের অগ্রগতির একমাত্র পথ। কারণ গান্ধীজির মতে মর‍্যালিটি অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত। গান্ধীজি কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর না করেই ধরে নিয়েছেন মানুষ অরিজিন্যালি গুড (মানুষ মাত্রই মূলত ভালো) আর এই গুডনেস অবিনশ্বর ও শাশ্বত সত্য। এইভাবে ফর্মাল লজিক-এর পথ ধরে গান্ধীজি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর ইনানসিয়েটেড মর‍্যাল প্রিন্সিপল (উদ্ভাবিত নৈতিকতার তত্ত্ব) মানুষের সেই এসেন্সিয়াল গুডনেসেরই (মৌলিক ভালত্বেরই) সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ প্রকাশ। গান্ধীজি মনে করতেন—শোষণ, অত্যাচার ও মানুষের সমাজের সমস্ত অকল্যাণের মূল কারণ হল লোভ, হীনমন্যতা, কাপুরুষতা সর্বোপরি মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার অভাব। তাই উদারতা, সৎসাহস, মানুষের প্রেমের আদর্শ ও নিঃশঙ্ক সত্যাগ্রহী মনোভাবের দ্বারা সমাজের অভ্যন্তরের মানুষগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই এ সমস্যার সত্যিকারের সমাধান সম্ভব। আগেই বলা হয়েছে যে, গান্ধীজি গোড়ায় ধরে নিয়েছিলেন, মানুষ অরিজিন্যালি গুড। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত এই শুভবুদ্ধিকে

শয়তান আচ্ছন্ন করার ফলে শোষণ, অত্যাচার, লোভ, হীনমন্যতা মানুষের সমাজে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। মানবতাবাদী মূল্যবোধের সাথে ঈশ্বরতত্ত্বের সংমিশ্রণের ফলেই গান্ধীজির এরূপ বিভ্রান্তি।

এখানে একটি কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, নৈতিক চরিত্র উন্নত করতে হবে— এ ব্যাপারে গান্ধীজির সাথে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। বিরোধ আসলে দেখা দিয়েছে নৈতিকতার প্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপারে। কী সেই নৈতিকতার ধারণা, যা সমাজ প্রগতির পরিপূরক— আজকের এই চূড়ান্ত শ্রেণি-সংগ্রামের যুগে যা শ্রমিক শ্রেণি ও শোষিত শ্রেণির মুক্তি সংগ্রামের সহায়ক ও পরিপূরক? বিরোধ দেখা দিচ্ছে এইখানে। গান্ধীজি যেখানে মানুষের নৈতিকতার প্রশ্নটিকে শ্রেণি-নিরপেক্ষ ও শ্রেণি-সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা মূল্যবোধ বা নীতিজ্ঞান বলে মনে করতেন, আমরা সেইখানে নৈতিক ধারণাগুলিকেও শ্রেণি ভাবনা-ধারণা বলে মনে করি। অর্থাৎ গান্ধীজির নৈতিকতার ধারণাটিও যে আজকের দিনে একটি বিশেষ শ্রেণির নৈতিকতার ধারণা মাত্র একথা বুঝতে পারেননি বলেই গান্ধীজি শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শ্রেণি সংগ্রামের ঐতিহাসিক আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। অ্যান্টাগনিস্টিক সোস্যাল ফোর্স (বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বে লিপ্ত সামাজিক শক্তি) বলতে গান্ধীজি সমাজের দুইটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণির ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। সুনীতি বনাম দুর্নীতির দ্বন্দ্বকে গান্ধীজি সমাজের ভিতর মূল পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ বলে ধরে নিয়েছেন। আসলে সেগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল ও লেবার-এর (পুঁজি ও শ্রমের) পরস্পর বিরোধী রূপ ও সংঘর্ষের সুপারস্ট্রাকচার মাত্র। অর্থাৎ ঈর্ষা, লোভ প্রভৃতি যে সমস্ত কুমনোবৃত্তিগুলিকে সমস্ত রকমের ব্যাভিচার, অত্যাচার ও শোষণের মূল বলে গান্ধীজি ভাবছেন আসলে সেগুলোই হচ্ছে বাই-প্রোডাক্ট অফ দি ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম (পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে জন্মানো ধ্যান-ধারণা)। গান্ধীজির এই সমস্ত ভুল ধারণার মূল নিহিত রয়েছে পূর্ব কথিত 'বুর্জোয়া সুপারস্টিশন,' 'থিয়োরি অফ বিলিফ' ও 'থিঙ্কিং ইজ কন্টেমপ্লেশন অফ গড' — এই সমস্ত অদ্ভুত ও অতিপ্রাকৃত মতবাদের মধ্যে।

প্রথম প্রকাশ ঃ
বিশেষ সংখ্যা গণদাবী, ১৯৪৯